

মুখবন্ধ

‘ইতিহাস’ বলতে আমরা জানি, ইতি-হ + আস্ অর্থাৎ অতীতে যে রূপে ছিল। ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ইতিহাস হ’ল— “মানুষদের একটা সময়ের বিজ্ঞান।”^১ আবার ইতিহাসকে বলা যায়, সমসাময়িক বিষয়ের চর্চা ও আলোচনা। এককথায় মানুষের সামগ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা হ’ল ইতিহাস। সময় থেমে থাকে না। পলকে পলকে বর্তমান অতীত হয়ে যায়। আর এই নিকট অতীত, দূর অতীত, দূরের দৃশ্যপট, কাছের দৃশ্যপট মিলে মিশে ইতিহাস রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ‘মহাভারত’ সম্পর্কে বলেছেন—“ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।”^২ আবার এই গ্রন্থেই রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই মন্তব্য করেছেন— “মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।”^৩ কাজেই ইতিহাস বললেই যে একটা কাঠখোঁটা শুষ্ক ধারণার কথা আসে তা কিন্তু নয়। যেখানে মানুষ ও তার সভ্যতার ইতিহাস থাকে তাকে কখনোই নিঃসার বলতে পারি না। আশীন দাশগুপ্ত তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন—“অতীত এবং ইতিহাসের অতীত এক নয়। সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষ নবাগত। ... ইতিহাসের অতীত যেহেতু সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত সে জন্য সাধারণ অতীতের সামান্য অংশ। অন্যদিকে অতীত প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি।”^৪ অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে মানুষের দূর অতীতের যোগের সঙ্গে ও নিকট অতীতের যোগ সূত্রেই ইতিহাস তৈরি হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি ইতিহাসের তথ্য ও সত্য মানুষের জীবনেরই সত্যের দিক। তবে ইতিহাসবিদদের ধারণা অতীতের ধারণা থেকে আধুনিককালে অনেকটাই আলাদা হয়ে পড়েছে। আধুনিককালে ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন ইতিহাসবেত্তারা।

আবার এই ইতিহাসকে নূতন করে পুনঃরূপ দানের পরিচয়ও কম নয়। ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বলতে বোঝায় ইতিহাসের কোনো বিষয় বা বস্তুর পুনঃরূপ দান বা পুনর্গঠন। অর্থাৎ যা ছিল তারই পুনর্নির্মাণ। এবার প্রশ্ন হ’ল এই পুনর্নির্মাণ কেমন হবে? ছবছ নকল হবে কি? উত্তরে বলা যায়, কোনো বস্তু, চিত্র, মূর্তি বা রূপের পুনর্নির্মাণ হলে এককথা আর কোনো অতীত যুগের বা ইতিহাসের অতীত উপাদান ও বিষয়ের পুনর্নির্মাণ হ’লে আর এক কথা। যদি বলি পূর্বোক্ত পুনর্গঠন বা পুনঃরূপ তাহলে ছবছ নকল করা হয়। অর্থাৎ যা ছিল তাই-ই থাকবে। আর যদি ইতিহাসের অতীত উপাদান ও বিষয়বস্তুর পুনর্নির্মাণ হয় তাহলে সেটা কীসের মাধ্যমে হবে সেটা দেখা দরকার। ধরাযাক, যদি সাহিত্যের রূপে ভাষার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয় তাহলে ছবছ বা অবিকল

হবে না। সাহিত্যের নিয়ম নীতি একটু আধটু আলাদা। সাহিত্য ইতিহাসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে না। অ্যারিস্টটলের মতও তাই—“Poetry... is a more philosophical and a higher thing than history; for poetry tends to express the universal, history the particular (ix).”^৬ ইতিহাসে ইতিহাসের সত্য ও তথ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়। সেখানে যা ঘটেছে তারই বিবরণ দেওয়া হয়। যা ঘটতে পারে তার ধারণা ইতিহাসে নেই। কিন্তু সাহিত্যে যা ঘটতে পারে, যা সম্ভাব্য বা সম্ভাব্যতার সূত্রে নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার কথা বলে তাই-ই সাহিত্যের মূল শর্ত। অশীন দাশগুপ্ত মহাশয়ও তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—“শুধু ইতিহাসের কল্পনা এবং সাহিত্যের কল্পনা এক জাতীয় নয়। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ঘটনার বাইরে থাকে। ঐতিহাসিক, দর্শক। সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে। সাহিত্যিক, স্রষ্টা।”^৭ সাহিত্যে লেখকের মনন সঞ্জাত কল্পনা থাকবে তবে সেই কল্পনা মুখ্য নয়; জীবন নির্ভর, জীবন মুখ্য। তাই সমগ্র মানুষের জীবন ও কর্মের কথা বলে সাহিত্য। সাহিত্যের মাধ্যমে একজন খাঁটি মানুষকে চেনা যায়। এককথায় দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে তার সন্ধান পাওয়া যায় সাহিত্যে। বিশেষ করে কথাসাহিত্য তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

পাশাপাশি সাহিত্য যখন ইতিহাসের পটভূমি, প্রেক্ষিত, বিষয় উপাদান চরিত্র নিয়ে রচিত হবে তখন সেই সাহিত্য ইতিহাস আশ্রয়ী বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হবে। তবে ইতিহাসের সত্য ও তথ্যকে বজায় রেখেও একজন দক্ষ সাহিত্যিক ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য রচনা করবেন। যেখানে অবিকল ইতিহাসের তথ্যের পরিবেশন দেখা যায় যা, ইতিহাস যেখানে নীরব থাকবে সেখান থেকেই সাহিত্যের শুরু হবে। কিম্বা ইতিহাসের অস্পষ্টতা নিয়েও একজন সাহিত্যিক বা স্রষ্টা ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। স্রষ্টার মূল লক্ষ্য হবে সত্যিকারের রস সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘ঐতিহাসিক রস’। এভাবেই ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ ব্যবহারের ফলে তৈরি হয় ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রভৃতি। আর ইতিহাসের তথ্য ও সত্যকে যখন নতুন রূপে নতুন ভাবে পুনঃরূপ দেওয়া হয় তখন সেটা হয় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ। বাংলা সাহিত্যে যার সূত্রপাত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে। বিশেষ করে রামরাম বসুর ‘রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের মাধ্যমে ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ, চরিত্র ও উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যাকে বলা হয় ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। সেই লক্ষণ থেকে ছোটগল্পও বাদ পড়ে নি। এভাবেই ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জন্ম হয়। বাংলা সাহিত্যে শশিচন্দ্র দত্তের পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ (১৮৫৭) যার দুটি পর্ব, যথা; ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ ও ‘সফল

স্বপ্নে’ ইতিহাসের উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এরপরে সার্থকভাবে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারীদেবী, চণ্ডীচরণ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করলেও উল্লিখিত ঔপন্যাসিকগণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাসের অনুবঙ্গ, উপাদান, বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই ধারায় কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জগৎ বাংলা সাহিত্যের জগতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন জনপ্রিয় কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোল পত্রিকার সমকালীন হয়েও তিনি কখনো কল্লোলের লেখক ছিলেন না। প্রধানত বসুমতী, ভারতবর্ষ ও প্রবাসী পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্যকে তিনি কখনোই মানতে পারেন নি। কল্লোলপত্নীরা যেভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করে উপন্যাস ও গল্পে মানব জীবন সম্পর্কে লিখছিলেন সেই তীব্র রুঢ় বাস্তব জীবন সম্পর্কে চর্চা না করে তিনি এক রমণীয় সৌন্দর্যের জগৎ গড়েছিলেন। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে তিনি সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের পথ অনুসরণ না করে এক অভিনব সৌন্দর্য লোকের সন্ধান করেছেন। দারিদ্র্য বিলাস বা যৌনচেতনার উদগ্র প্রকাশ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। জগদীশ গুপ্তের ‘লঘুগুরু’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ কিংবা ‘প্রাগৈতিহাসিক’ ও ‘সরীসৃপ’-এর মতো আখ্যান রচনায় তিনি পক্ষপাতী নন। কল্লোলীয়ানদের কুটিল-জটিল মনস্তত্ত্বের বিপ্রতীপে থেকে তিনি সত্যিকারের রস সাহিত্য রচনা করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন—“রসসৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। যাঁহারা কেবল সত্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত তাঁহারা ঋষি হইতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক নহেন।”^{১১} শিশু কিশোর কাহিনি সামাজিক কাহিনি, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা, গোয়েন্দা কাহিনি, ঐতিহাসিক আখ্যান, অতীতাশ্রয়ী রোমান্টিক আখ্যান ও কৌতুক রসের রচনায় তিনি রোমান্স রসেরই অবতারণা করেছেন যার ব্যাপ্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত। সমকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও একটি মন্তব্য থেকে তাঁর সাহিত্যিক মানসতার রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—“আমি সাহিত্যিক, কোনও ism-এর ধার ধারি না। Realism, Romanticism প্রভৃতি বাক্য আমার কাছে সমান নিরর্থক। আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রস সৃষ্টি করাই আমার

স্বধর্ম।”^৮ রোমান্স প্রিয়তা ও সাঙ্গীতিক ধর্ম উভয়ই তাঁর কবিত্বে মিশে রয়েছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের আত্মবঞ্চনা, নিষ্ঠুর স্বপ্নভঙ্গ, মূল্যবোধের নৈতিক অধঃপতন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। জীবনকে সুন্দর সহজ ও অনাবিল রূপেই দেখতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় নারী পুরুষের আকর্ষণের ছবি থাকলেও তা কখনোই উদগ্র কামনায় পর্যবসিত হয়নি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৯২৯ থেকে তাদের কালসীমার সূচনা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ‘জাতিস্মর’ (১৯২৯), ‘বোমকেশের কাহিনী’ (১৯৩৪), ‘ডিটেকটিভ’ (১৯৩৭), ‘চুয়াচন্দন’ (১৯৪২), ‘কাঁচামিঠে’ (১৯৪২), ‘দস্তুরুচি’ (১৯৪৬), ‘পঞ্চভূত’ (১৯৪৬), ‘শাদাপৃথিবী’ (১৯৪৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরসগল্প (১৯৫২), ‘কালকূট’ (১৩৫১), ‘গোপন কথা’ (১৩৫২), ‘বুমের্যাং’ (১৩৫৩), ‘ছায়াপথিক’ (১৩৫৬), ‘বিষকন্যা’ (৩য় - সংস্করণ, ১৩৫৯), ‘দুর্গরহস্য’ (১৩৫৯), ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ (১৩৬১), ‘কানু কহে রাই’ (১৩৬১) এবং গল্প সংগ্রহ ‘মায়াকুরঙ্গী’ (১৩৬৫)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — ‘কালের মন্দির’ (বাংলা ১৩৫৮, ইং. ১৯৫০), ‘গৌড়মল্লার’ (বাংলা ১৩৫৯, ইং. ১৯৫২), ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ (বাংলা ১৩৬৫, ইং. ১৯৫৮), ‘কুমার সম্ভবের কবি’ (বাংলা ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩), ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৭২, ইং. ১৯৬৩-১৯৬৫), ‘ঝিন্দের বন্দী’ (প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৪৫, ইং. ১৯৩৮)। ‘বিষের ধোঁয়া’ (বাংলা ১৩৪০, ইং. ১৯৩৩), ‘ছায়াপথিক’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬, ইং. ১৯৪৯), ‘দাদার কীর্তি’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, ইং. ১৯১৫ লেখা হয়), ‘মনচোরা’ (বাংলা প্রথম প্রকাশ ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩) ইত্যাদি। এছাড়াও কাব্য, নাটক, চিত্রনাট্য, দিনলিপি, মনকণিকা, চিঠিপত্র, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

তিনি বিভিন্ন ধরার গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই রস সাধক শিল্পীর গল্প ও উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি :

- যেমন —
১. ইতিহাসাশ্রিত গল্প
 ২. ডিটেকটিভ গল্প
 ৩. অতিপ্রাকৃত গল্প
 ৪. সামাজিক-পারিবারিক
 ৫. হাসির গল্প
 ৬. অন্যান্য শ্রেণির গল্প (কিশোরদের গল্প ইত্যাদি)

উপন্যাসগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে পারি —

১. ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

২. পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস

তবে ইতিহাসাশ্রিত গল্প ও উপন্যাসগুলি নিয়েই সাহিত্যে তাঁর জনপ্রিয়তার সিংহাসন দখল। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’-এর উৎকর্ষতার গুণে ১৯৬৭ তিনি রাজ শিরোপা স্বরূপ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। শরদিন্দু এই জাতীয় ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য নিয়ে আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর ছয়-সাতের দশক পর্যন্ত এই উপন্যাস ও গল্পগুলির সময় সীমা। অতীতের মায়াময় ধূসর জগতকে তিনি কাছের দৃশ্যপটরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনার ফলে অতীত জীবন আমাদের কাছে রমণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ চিত্র এই জাতীয় লেখাগুলিতে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত। ইতিহাসের নীরবতাকে কাজে লাগিয়ে সত্যিকারের সাহিত্য সৃষ্টি করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। তাছাড়াও জাতিস্মর ধারার গল্পগুলিও আমাদের মন কাড়ে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলির প্রশংসা করে বলেছেন— “তুমি যখন সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গল্প উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর, সে কালের সন্ন্যাসী, সেনাপতি সামন্ত, সেই নাম ধাম, সেকালের উপযোগী কথোপকথন সে এক অভিনব কল্পলোক।”^{৯০} কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘অমিতাভ’ গল্পটি পড়ে মন্তব্য করেন— “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে কেঁদেছি। এখনও কাঁদি। তোমার দিঙনাগের মত কেঁদে গেলে যেতে চাই পারি না।”^{৯১} আবার কবি ও সমালোচক মোহিতলাল লেখেন— “আপনার শক্তি ও সাধনা দুই-ই আছে তাহার প্রমাণ আপনার ওই গল্পগুলি।”^{৯২} ইতিহাসাশ্রিত রমণীয় সুখপাঠ্য উপন্যাস সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য— “তোমার লেখার একটা যাদু আছে, তুমি আনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও। তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী - দুই-ই তোমার তুল্যমূল্য।...”^{৯৩}

ভাষা ব্যবহারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, style তৈরির ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত, আখ্যান নির্মাণে প্রথাগত নিয়মের পরিপন্থী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মৌলিক চিন্তার অধিকারী। রাজশেখর বসুর মতো শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রয়ী বলুন বা অন্যান্য শ্রেণির গল্প উপন্যাসের কথা বলুন তাঁর প্লট বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণের কথা আমরাও অনুভব করি। বাস্তবিকই ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ জাতীয় গল্প কিংবা ‘তুমি সন্ন্যাসীর মেঘ’, ‘তুঙ্গ ভদ্রার তীরে’র মত উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান পাঠককে আদ্যন্ত

আকর্ষণ করে রাখে। তাই শরদিন্দুর সমকালের পাঠক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, ভারতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে আজকের দিনের পাঠক, সমালোচক, অধ্যাপক সকলই একবাক্যে তাঁর প্লটের দুর্নিবার আকর্ষণ শক্তির কথা বলেন। তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন রস সৃষ্টিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহিত্যে সেই রসসৃষ্টির ব্যাপারটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাসে থাকে সময়ের কালজ্ঞান কিন্তু সাহিত্যিককে কল্পনা শক্তির জোরে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যকে সম্ভাব্যতার সূত্রে গ্রথিত করে রচনা করতে হয় রসসাহিত্য। নিছক ইতিহাসের ঘটনা বিবরণের পরিচয় দেন না। অতীত যুগের ঘটনা, সমাজ-পরিবেশ মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে বর্তমানের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেন। বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন পাঠক ও পাঠিকার। ইতিহাসের স্বল্পোজ্জ্বল উপাদানের ভিত্তিতেও একজন মহৎ সাহিত্যিক বড়মাপের ও উঁচুমানের সাহিত্যও সৃষ্টি করে থাকেন। যেমন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিহাস নামমাত্র, সাহিত্য পদবাচ্য রূপই একজন ঐতিহাসিক আখ্যান নির্মাতার একমাত্র ও আদিতম শর্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিন্তু তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে এই বিষয়টিরই ওপর অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রচিত অতীতশ্রয়ী কথাসাহিত্যে ইতিহাসের কথা-প্রসঙ্গ এনে তিনি একদিকে যেমন অতীত যুগচিত্রকে বাস্তবোচিত রূপ দান করেছেন তেমনি অন্যদিকে ইতিহাস ও সাহিত্যের ব্যবধান কমিয়েছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিষ্ট চিন্তে উপলব্ধি করেছেন উপন্যাসে অতীত যুগচিত্র ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র রাজরাজড়ার কথা, ইতিহাসের যুগবৈশিষ্ট্যের কথা, ধ্রুপদী যুগের ভাষা, উচ্চমার্গের কল্পনাশক্তির সহযোগে পরিবেশন করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন কৌশলের মধ্যে দিয়ে অতীত জীবনের প্রবেশ করার রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শরদিন্দু তাতে আর একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করলেন। জাতিস্মরণ-প্রকরণ কৌশলকে সযত্নে ব্যবহার করে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ধ্রুপদী যুগ ও জীবনকে গল্প উপন্যাসে স্থান দিলেন। পূর্বজন্মের কথা প্রসঙ্গ আখ্যান-বস্তুতে নিয়ে এসে সুকৌশলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে রসনিবিড় করে সাহিত্যে রসঘন করে তুললেন। ড. নিতাই বসু মন্তব্য করেছেন — “সর্বাধিক সফল শরদিন্দুর জাতিস্মরণ-ধারার গল্পগুলো। প্যাশন এখানে প্রেমের উপর স্পর্ধিত ভঙ্গিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তা নিছক যৌন-আবেগ নয়, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন নয়, বাসনায় বন্ধোমাঝে চিরবিচিত্র অতৃপ্ত মানব মনেরই চিরন্তন হাহাকার। জন্মান্তরের স্মৃতি, জাতিস্মরের কল্পনা যেন ফ্রেম, যার মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি বসানো হয়েছে।”^{১০} তিনি কখনো স্বপ্নে, কখনো বা বস্তু সাদৃশ্যে আবার কখনোবা গন্ধে, অবচেতনায় জাতিস্মরণতায় ডুব দিয়ে দক্ষ ডুবুরীর

মতো ধূসর মায়াময় কুণ্ডলায়িত অতীত জগতকে তুলে নিয়ে এসেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘সেতু’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘রুমাহরণ’, ‘বিষকন্যা’, ‘প্রত্নকেতকী’, ‘দেখা হবে’, ও ‘মায়া কুরঙ্গী’ প্রভৃতি গল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ—

মুখবন্ধ	:	
প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারা
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের ভূমিকা
তৃতীয় অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
চতুর্থ অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
পঞ্চম অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার
উপসংহার	:	
গ্রন্থপঞ্জি	:	
পরিশিষ্ট বা সংযোজিকা	:	
নির্ঘণ্ট (ইনডেক্স)	:	

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উল্লিখিত অধ্যায়গুলিতে ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস’ বিষয়টি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মানসতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তির স্বরূপটিও উল্লিখিত বিষয়টিকে অবলম্বন করে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। সাহিত্যের বিন্যাসে শাখায় অন্যান্য প্রকরণ তাঁর সফলতার দিকটি ধরা পড়লেও বলা যায় যে, তিনি কথাকার হিশেবে সফল হয়েছেন মূলত ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য রচনায়।

নির্দেশিকা :

১. ইতিহাস লেখকের কাজ, মার্ক ব্লক, ভাষান্তর—আশিস কুমার দাস, সম্পাদনা—প্রভাত দাশগুপ্ত, পৃ. ১৫
২. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, সম্পাদনা—ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার, পৃ. ২৩২
৩. তদেব,
৪. ইতিহাস ও সাহিত্য, অশীন দাশগুপ্ত
৫. অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৩
৬. ইতিহাস ও সাহিত্য, অশীন দাশগুপ্ত, পৃ. ২৮
৭. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮
৮. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৪৭৪
৯. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, চিঠিপত্র, পৃ. ৪৩৭
১০. তদেব, পৃ. ৪৪৯
১১. তদেব, পৃ. ৪৩২
১২. শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৬১৬
১৩. সত্যশ্লেষী শরদিন্দু, ড. নিতাই বসু, পৃ. ৪৯